

ক্লোরাকি বিজ্ঞানের ঔৎস মঙ্গানে -১

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

একঃ

ইন্টারমিডিয়েট লেবেলে কলেজের ইংরেজী এন্টলজিতে পড়া একটি গল্প আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। অনেকেই গল্পটির কথা জেনে থাকবেন। আমেরিকান লেখিকা মারজারি কিনান রাওলিন্স এর 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' (A Mother in Manville)। কাহিনী এ রকম- লেখালেখি বিষয়ক একটা এসাইনমেন্ট-এর কাজে লেখিকা মারজারি নর্থ ক্যারোলিনার পাহাড়ে অবস্থিত একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রমে কিছুদিন কাটান। সেখানে জেরি নামে একটা বাচ্চার সাথে তার পরিচয় ঘটে। জেরি লেখিকাকে প্রতিদিন আঙুন পোহানোর কাঠ কেটে দিত। সে ছিল প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। জেরি আলাপ প্রসঙ্গে লেখিকাকে জানায়, তার মা জীবিত এবং মাঝে মাঝে তাকে দেখতে ও আসেন এটা সেটা উপহার নিয়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখিকা আশ্রমে চাকুরীরত জনৈক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারেন- জেরীর মা, বাবা কেউই আসলে জীবিত নেই এবং তাকে কেউ দেখতে আসার কথা ও ঠিক না। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটলে ও পাঠক-পাঠিকার মনে কাহিনীটি একাধিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। জেরী কি তাহলে মিথ্যুক? কেন সে ফাঁদিয়ে ওরকম একটি গল্প লেখিকাকে বলতে গেল? সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একাধিক- জেরী অনাথ বালক হিসেবে কারো করুণা বা সহানুভূতি নিতে চায়নি। অথবা, লেখিকাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়েছে; তাই নিজের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে চেপে রাখতে কল্পনায় সে একজন মাকে সৃষ্টি করেছে। তা না হলে সম্ভবত তার আত্ম-পরিচয়ের সংকট দেখা দিত।

দুইঃ

জামিলুল বাসার ও বিপ্লব পালের উদ্দেশ্য আমি 'আসুন, খোলস ছেড়ে বের হই' নামে সম্প্রতি একটি লেখা লিখেছিলাম। অবশ্য দুজনকে ভিন্ন দুটি বিষয়ে লিখেছি। ক্লোরাকের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা যে স্বেচ্ছা আহাম্মকিই নয়, স্বয়ং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর ও বটে- জামিলুল বাসারকে সে বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলাম। পাল এবং বাসার সাহেব দুজনেই আমাকে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পালকে আমি উত্তর লিখেছি। এবার জামিলুল বাসারকে লিখছি।

ভূমিকায় উল্লেখিত *এ মাদার ইন ম্যানভিল* গল্পের জেরীর সাথে জামিলুল বাসার, বা এই জাতীয় মুমিনদের মননের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিনয়ী, প্রত্যয়ী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জেরী যেমন কল্পনায় একজন মাকে সৃষ্টি করেছে যিনি সন্তান কে ভালবাসেন, উপহারসহ দেখতে আসেন, তার সাথে সময় কাটান, ঠিক তেমনি জামিলুল বাসাররা স্বীয় গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে একই ভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন ক্লোরাকে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের গাঁজাখুরি গল্প- যার সারমর্ম মোটামোটি এই রকমঃ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে উন্নত ইহুদী-নাসারা-খৃস্টান পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় আমরা (মুমিনরা) মোটেও পিছিয়ে নেই। বরং বহু ধাপ এগিয়ে। ওরা (পশ্চিমা) বহু বছর গবেষণা করে যা বের করেছে, আমাদের নিরক্ষর মহানবী আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেই তা জানতেন (আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে)। কাজেই ভায়েরা, মহব্বতের সাথে সুর করে পড়ুন, সুবহানাল্লাহ!

পাঠক মনে রাখবেন, এই প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে তখনই তত বেশি দেখতে পাবেন, তার স্বীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সংকট যখন যত বেশি হবে। উপরের গল্পে লেখিকার মাতৃসম স্নেহ, ভালবাসা জেরীকে কল্পনায় মাকে আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অমুসলিমদের বিশাল কর্তৃত্ব জামিলুল বাসারদের ঠেলে দিচ্ছে ক্লোরাকে বিজ্ঞান খোঁজার দিকে। জামিলুল বাসারের লেখা থেকে নিদিষ্ট মনতব্ব্যের সূত্র ধরেই আমি এগোতে চাই। তবে তার আগে এই সুযোগে (একই বিষয়ে বার বার লেখতে চাই না বিধায়) কিছু কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের ভয়াবহ অজ্ঞতার আরেকটু উদাহরণ দেয়া যাক।

মুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আমাকে নিয়ে আক্ষেপ করেন। জানতে চান, ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়ে ও আমি কেন ধর্মে বিশ্বাস করি না। কেউ কেউ রেফারেন্স দিয়ে আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করেন। যেমন- *আরে ভাই, এত বই পড়েন অথচ এটা ও জানেন না, স্বয়ং আমেরিকার এক জন মনীষী গবেষণা করে বলেছে, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের (?) সর্বশ্রেষ্ঠ (?) মহামানুষ (!)।* বিশেষণের ভুল প্রয়োগ দেখে আমি অবাক হই। বুঝতে পারি, অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ মানসিক অসুখ ধরনীর বুকে খুব কমই আছে। কারণ আমেরিকার সেই মনীষীর বইটির সরাসরি ইংরেজী ভার্শন আমি পড়েছি আর এঁদের বেশির ভাগই পড়েছেন এর অসম্পূর্ণ এবং ভুল বাংলা অনুবাদ (যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে)। মূল বইটি লিখেছেন মাইকেল হার্ট (Michael H. Hart) নামের আমেরিকান একজন সাংবাদিক। নাম দিয়েছেন *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* মাইকেল হার্ট নিজেই বইটির ভূমিকায় (যা অবৈধ বাংলা ভার্শনে অনুপস্থিত) পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন, তিনি যা করতে চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী (the most influential) লোকজনের একটি তালিকা তৈরী করতে, যার সাথে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং যা কোন ক্রমেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের তালিকা নয়। যেমন *বইটিতে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথমে যেমনি মুহাম্মদকে স্থান দেয়া হয়েছে, তেমনি একই তালিকায় ৩৯ নং এ আছেন স্বয়ং হিটলার।* অন্যান্য র্যাংকিং এ এসেছে স্টালিন, চেঙ্গিস খানদের নাম। মজার ব্যাপার, বইটির অবৈধ বাংলা সংস্করণের সংখ্যা একাধিক এবং টাইটলে বইয়ের নাম এসেছে বিকৃত আকারেঃ ' *ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা* '। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক মূর্খরা বইটির কেবল বাংলা অনুবাদ পড়েছে, আর ইংরেজীটা ছুঁয়ে দেখলে ও খুব সম্ভবত *the most influential* এবং *the greatest* এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মত বুদ্ধি নেই (আল্লাহর আরেক ইচ্ছা বোধ হয়)। তাই

তারা অহেতুক রেফারেন্সে আপ্ত হয়। কম বেশি একই রকম অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় অনেক শিক্ষিত মুসলমান যখন তারা মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজ পরিবারে চাকরী করা এক খুস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইয়ের বিষয় বস্তুতে। বইটির নামঃ *Bible, Quran and Science* মজার ব্যাপার বাইবেল, কোরাণ এবং বিজ্ঞানের এর মধ্যে কোরাণ কে চূড়ান্ত সত্য (?) বললে ও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি। হওয়ার অবশ্য দরকার ও নেই কারণ জানা গেছে কোরাণকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলি কে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে তিনি যেন একটি ইম্প্রসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রুডলার।

তিনঃ

বাসার সাহেবের কথায় ফিরে আসি। উনার লেখা পড়ে একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার সাধারণ মেথোডোলজি (methodology) সম্পর্কে ভদ্রলোকের ন্যূনতম ধারণা ও নেই। অবশ্য এ জন্য হাই স্কুলের বিজ্ঞান পুস্তকই যথেষ্ট হওয়া উচিত; কারো রকেট সাইয়েন্টিস্ট হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু বাংলায় যে কোন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করার পাবলিক নয়। নাহলে বাসার সাহেব বুঝতেন, বিজ্ঞান কার্য-কারণ অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সলিড গবেষণার ভিত্তিতে এগোয়, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য নেই এখানে। আর ধর্ম গ্রন্থের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অগাধ এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাস। তেলে জলে কি আর মেশে? ধরা যাক ডিএনএ (DNA) আবিষ্কারের ব্যাপারটা। পুরো নাম- ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। ডিএনএ-কে বলা হয় 'জীব দেহের প্রধান অণু' (the master molecule of life)। কেউ কেউ আদর করে ডিএনএকে ডাকেন 'প্রচার মাধ্যমের প্রেমসী' (the darling of the media)। যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী না, তাঁরা ও জ্বীণ থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (human genome project), ইত্যাদির নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডিএনএ (ডিএনএ আর জ্বীণের পার্থক্য হচ্ছে- বিশাল দৈর্ঘ্যের একে একটি ডিএনএ অণুতে রয়েছে অনেক গুলি আলাদা আলাদা অংশ যা জ্বীণ বলে পরিচিত)। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আধুনিক জীব বিজ্ঞানের গবেষণায় ডিএনএ-র গুরুত্ব অপরিহার্য। এই ডিএনএ-র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদি ও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক এর ডাবল-হেলিক্স মডেল ডিএনএ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোন ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন- পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডিএনএ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সাল গুলো উল্লেখ করছি-(সূত্রঃ *nature*, human genome issue)

- ১৮৬৯ সালে - সর্বপ্রথম জীব কোষ থেকে ডিএনএ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সালে - মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ১৯০০ সালে - জোহান ম্যাডেলের মটরগুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সালে - বংশগতি (hereditary) বিষয়ে ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সালে - সর্বপ্রথম জ্বীণ শব্দ টি চালু হয় (এটি কোরাণে বর্ণিত কোন জীন নয়-লেখক)।
- ১৯১১ সালে - ফ্রুট ফ্লাই এর গবেষণা ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সালে - এক জ্বীণ-এক এনজাইম তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সালে - ডিএনএ -র এক্সরে ডিফ্রেকশন বিষয়ে গবেষণা করা হয়।
- ১৯৪৪ সালে - ডিএনএর ট্রান্সফরমেশন (transforming) নীতির আবিষ্কার।
- ১৯৫২ সালে -জ্বীন যে আসলে ডিএনএ দিয়ে তৈরী, তা জানা যায়।
- ১৯৫৩ সালে -জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল-হেলিক্স মডেল এর মাধ্যমে ডিএনএ র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সে সময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর -লেখক)। ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রিয় পাঠক -পাঠিকা, উপরের উদাহরণ দ্বারা আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, বিজ্ঞানের এক একে একটি আবিষ্কারের পিছনে থাকে বর্তমানের উপাত্ত ছাড়া ও পূর্ববর্তী বহু বিজ্ঞানীদের নিরলস শ্রম ও মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে রেখে যাওয়া তথ্য সমূহ। এমতাবস্থায় কোরাণ-বেদ-বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সামঞ্জস্য খোঁজা কেবল অর্বাচীনই নয়, বরং সেটি বিজ্ঞানীদের মহান অবদানকে অস্বীকার, অবমাননা ও অপমান করার সামিল বলে আমি মনে করি। অথচ কতিপয় মুখ্য তাই করছে। আর এ হীন কাজে তাদের সংগী হচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেসী, লোভী এবং নাম-নর্বস্ব বিজ্ঞানী। যেমন- বাংলাদেশে ডঃ শমসের আলী "Scientific Indications in The Holy Quran" নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে কোরাণের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে ডিএনএ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, কোরাণে ডিএনএ-র ব্যাপারে পর্যন্ত ইংগিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম-

এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ (৪৫:৪) (অনুবাদ লেখকের)

বলুনতো, এর সাথে ডিএনএ অণুর সম্পর্কটা কোথায়? এই মূর্খতার (নাকি, শঠতা) শেষ হবে কবে?

(আগামী পর্বে সমাপ্য)